এই সময়
সংবাদপত্র

Text View Image View Comments Email Print

14/09/2015

# বড়ো দলগুলির আস্ফালনে থমকে রাজনীতি,রাজ্যবাসীর দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে কেউ ভাবে ?

Enlarge Image

বামফ্রন্টি বামপন্থীরা বিগত কয়েক সপ্তাহ যেন একটু ঘুম ঝেড়ে উঠেছে। কৃষক সভার ডাকে নবান্ন অভিযান এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘাত নিয়ে সংবাদমাধ্যম ও রাজ্যের মানুষ চর্চা করছেন। শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকে ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট নিয়েও সংবাদমাধ্যম ও রাজ্যের মানুষ চর্চা করছেন। গত চার বছরে বামেরা যে এই রাজ্যের একটা প্রধান বিরোধী শক্তি , তা তাদের কাজে কর্মে বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু সারা বছর ফাঁকি দিয়ে , পরীক্ষার কয়েক দিন আগে পড়াশোনা করলে ফল কেমন হয় তা অবশ্য আগামী বিধান সভা ভোটে বোঝা যাবে। সরকার পরিবর্তন হওয়ার অনতিবিলম্ব পরেই উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়াতে কৃষকদের উপর গুলি চলল। ঠিক যেমন ঘটেছিল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত হবার পরে মরিচঝাঁপিতে গুলি চলার ক্ষেত্রে। ২০১২ সাল থেকে রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যা হচ্ছে। বিরোধীরা যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সারদা কাণ্ড সামনে এল। লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ তাঁদের টাকা হারালেন। ২০১৩ সালে শাসক দলের এক সাংসদ এবং ২০১৪ সালে রাজ্যের এক মন্ত্রী জেলে গেলেন। সেই মন্ত্রী জেলে থেকেও আজ অবধি তার মন্ত্রিত্ব হারাননি। গত বছর , খবরে প্রকাশিত হল যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন তত্কালীন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন সারদার সঙ্গে ভারতীয় রেলের চুক্তি হয়েছিল। বিরোধীরা এই বিষয়ে 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী ' হুঙ্কার সংবলিত একটা দীর্ঘ আন্দোলন করতে পারতেন। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যদি এ রকম অবস্থায় বিরোধী দলনেত্রী হতেন তা হলে কিন্তু তিনি তাই করতেন। সিঙ্গুরে যদি কয়েক হাজার মানুষের দাবি নিয়ে কামাল করে দিতে পারেন তা হলে তো লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবি জড়িয়ে থাকা চিটফান্ড কাণ্ডে অবশ্যই যুদ্ধং দেহি মেজাজে দীর্ঘ আন্দোলন করতেন। রাজ্যকে প্রায় অচল করে দিলেও কেউ অবাক হতেন না। আসলে প্রধান বিরোধী জোট হয়তো এখনও মনে করে যে এমন সব ইস্যুতে এমন আন্দোলন করা যাবে না , যার ফলে ক্ষমতায় এলে তাদের নানা রকম প্রতিশ্রীতি ও পূর্বঘোষিত নীতির জালে আবদ্ধ থাকতে হবে। এই বিষয়েও তারা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু জায়গায় নৈরাজ্য চলছে। বিরোধীরা যে সে বিষয়ে মনে দাগ কাটার মতো কোনও গণআন্দোলন করেছেন , তা মনে করা যাচ্ছে না। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় সেটা হল কৃষক , শ্রমিক , ছাত্র , শিক্ষকদের অনেক ন্যায্য দাবিগুলো পিছনে চলে যাচ্ছে। সামনে আসছে হিংসার কাহিনি। উল্টো দিকে কৃষক , শ্রমিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের যে দাবিগুলো নিয়ে বিরোধীরা জমায়েত করছেন সে বিষয়ে শাসক দলের অভিমত কী ?সরকার বনাম বিরোধীসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের যে ইস্যুগুলি বাংলায় বার বার উঠে আসছে , সেগুলিকে স্রেফ হিংসা ও প্রতিস্পর্ধিতার মধ্যে লড়াই হিসেবে নিয়ে যেতে চায় সরকার। আমাদের দুর্ভাগ্য , যে বিরোধীরাও এর চেয়ে বেশি কিছু জানেন না। গত কয়েক দশক ধরে এই বাংলায় রাজনৈতিক জমি দখলের ক্ষেত্রে এবং ক্ষমতা জাহিরের ক্ষেত্রেও হিংসাই হয়ে উঠেছে প্রধান সম্বল। তাই যারা বিরোধী , তারাও চায় শো -ডাউন , যারা ক্ষমতায় , তারাও চায় মাজা ভেঙে দিতে। এর মধ্যে মানুষ কোথায় ? ২ সেপ্টেম্বর হল ধর্মঘট। ধর্মঘটিরা রাজ্য সরকারের গুষ্টির তুষ্টি করলেন , চেনা ছকে আগের দু-একদিন মিছিল নামালেন , ধর্মঘটের দিন বেশ কিছু মোড়ে জমায়েত ও মিছিল করলেন। কিন্তু যাদের ঘরে থাকার কারণে নাকি এই ধর্মঘটকে সফল বলা হল , যারা বিকেলে আলিমুদ্দিন থেকে অভিনন্দিত হল , তাদেরকে এই ধর্মঘটের ইস্যুগুলির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁরা কী করলেন ? প্রায় কিসুই না। যেমন তাঁরা বলতেন 'মানুষ ভুল করেছেন ', আজও বোধ হয় তাঁরা আশা করেন , মানুষ চাটাইয়ে সাঁটা পার্টির কাগজ দেখে নিজে নিজেই ইস্যুগুলি বুঝে নেবেন। এই দায়সারা রাজনীতি আর কত দিন ? সরকার চায় না ধর্মঘট হোক , কারণ ধর্মঘট শিল্পনাশা ও কর্মনাশা। কিন্তু শ্রম আইনে প্রস্তাবিত যে বদলগুলি নিয়ে এই ধর্মঘট , সেগুলি যে অদূর ভবিষ্যতে আরও কর্মনাশা হয়ে উঠবে , নাকি হয়ে উঠবে না , এ নিয়ে সরকারি দল বা তার ধামাধরা শ্রমিক সংগঠনের কি কোনও দায় নেই , কোন বক্তব্য নেই ? মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও কাজের দাবিতে ধর্মঘট ছিল। পুলিশ নামিয়ে ও বাস চালিয়ে তো আর বাজার দর নামানো যাবে না , বেকারের চাকরি জুটবে না , শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা বাড়বে না। অ্যাপ্রেন্টিস ব্যবস্থার নামে ন্যূনতম মজুরির তলায় মানুষকে গতরে খাটিয়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত নিহিত আছে প্রস্তাবিত শ্রম আইনের রদবদলগুলিতে , তা নিয়ে কি

আমাদের সরকারি দলের কোনও বক্তব্য নেই ? না থাকলে কেন নেই ? যারা এমন বদল চান , মাসে ৪০০০ টাকা দিয়ে সারা দিন নিজেদের কারখানায় খাটাতে চান যাঁরা , তা হলে এই সরকার আসলে তাদেরই ? যদি তা না হয় , সরকার জানাক যে এই প্রস্তাবিত আইনের নানা ধারা সম্বন্ধে তাদের মত কী।

ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে সরকারের জবাব যদি শুধুই হয় ট্রাম -বাস , মস্তান ও পুলিস , আর শ্রম আইন তথা ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে থাকে নিস্তব্ধতা , তা হলে বুঝতে হবে মায়ের পা আর মাটিতে নেই। উদাহরণ বিদ্যুদ্বামেরা অতিরিক্ত বিদ্যুত্ মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও জনসমাবেশ করছে। এ কথা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম অন্যান্য রাজ্যের থেকে বেশি। কলকাতা শহরের বিদ্যুত্ গ্রাহকরাও দেশের আর যে কোনও পাঁচটা বড়ো শহরের তুলনায় অনেক বেশি হারে প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে থাকেন। ২০১১ -র আদমসুমারি দেখাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে ৮২ শতাংশের উপর পরিবার আছে যাদের মধ্যে সব থেকে বেশি উপার্জনকারীর মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকার কম। আর মাত্র ৬ শতাংশের উপর পরিবার আছে যাদের মধ্যে সব থেকে বেশি উপার্জনকারীর মাসিক আয় দশ হাজার টাকার কম। ওই আদমসুমারি থেকে এটাও পরিষ্কার যে গরিব মানুষের সংখ্যার নিরিখে ও অর্থনৈতিক পশ্চাত্পদতার বিচারে ভারতের অল্প কিছু রাজ্যের সঙ্গে এখন পশ্চিমবঙ্গ পাল্লা দিচ্ছে। জনগণের করের টাকা যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাইনে বাবদ দেয় , এমন চাকুরিজীবীদের দিকে যদি তাকানো যায় তা হলে এক দিকে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও অন্য দিকে বকেয়া ৫৪ শতাংশ ডিএ (মহার্ঘ ভাতা ) না পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এর সঙ্গে যদি বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি যোগ হয় তা হলে তো মানুষ জল , হাওয়া , রোদ ছাড়া আর কিছুই খাবে না। কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এ হেন অবস্থা হল কেন ? আসলে বিদ্যুত্ ক্ষেত্রে এ হেন অবস্থা একচেটিয়া ব্যবসার জন্য। এই একচেটিয়া ব্যবসা মোবাইল বা ইন্টারনেট সুবিধার ক্ষেত্রে নেই। গ্রাহক তাঁর সুবিধা অনুযায়ী যে কোনও একটি কোম্পানির মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন। কোনও একটি কোম্পানির মোবাইল ও ইন্টারনেটের দাম ও পরিষেবা পছন্দ না হলে সেই কোম্পানির সুবিধা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও কোম্পানির নতুন গ্রাহক হন। কিন্তু বাংলায় বিদ্যুত্ ক্ষেত্রে , গ্রাহকের সেই স্বাধীনতা নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে এই একচেটিয়া ব্যবস্থা করেছিল বামফ্রন্ট। পরিবর্তন -এর স্লোগান তোলা সরকার কেন এই একচেটিয়া প্রকল্পের কোনও পরিবর্তন ঘটালেন না ? পঁচিশ বছর আগে আমাদের দেশে যখন নয়া উদারবাদী নীতি চালু হয়েছিল তখন রাষ্ট্রীয় মালিকানার একচেটিয়া দাপাদাপি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা শোনানো হয়েছিল। নয়া উদারবাদের প্রবক্তারা ও ঝানু রাজনীতিকরা অঙ্গীকার করেছিলেন যে অর্থনৈতিক পরিষেবার ক্ষেত্রে সুস্থ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হবে। গ্রাহকদের স্বাধীনতা বাড়বে। কিন্তু বাংলায় বিদ্যুত্ ক্ষেত্রের অবস্থা দেখলে মনে হয় কী ভীষণ রকম ভাঁওতা দিয়েছিলেন নয়া উদারবাদের স্তুতি আওড়ানো মাইনে নেওয়া প্রবক্তারা। বর্তমান সরকারও এই বিষয়ে উদাসীন। এমতাবস্থায় মানুষও যেন কিছুটা হাল ছেড়ে দিয়েছেন কারণ বিদ্যুত্ মাশুলের ব্যাপারে তাদের বেদনার কথা শোনার জন্য বড়ো কোনও রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসছে না। তা না হলে মানুষ প্রচুর সংখ্যায় কি এক দল ছাত্র -যুবদের পাশে দাঁড়াত না যাঁরা গত কয়েক মাস ধরে ধর্মতলা চত্বরে মাঝে মাঝে বিদ্যুত্ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধরনা দিচ্ছেন ? কয়েক দিন আগে সেই পতাকাবিহীন ছাত্র -যুবরা বিদ্যুত্ মাশুল বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে অনশনে বসেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী পুলিশ তাদের অন্যায় ভাবে গ্রেন্তার করে। তাদের মধ্যে আবার কয়েক জন জামিন না নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যেই অনশন জারি রাখে। একটা সঠিক ইস্যুতে নাগরিক আন্দোলনের প্রতি যে তাদের কোনও লোকদেখানো বা সুবিধাবাদী স্বার্থ নেই তা জামিন না নেওয়ার পদক্ষেপ ও জেলের ভিতরে অনশন জারি রাখার মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে যায়। অথচ শাসক ও বিরোধী দলের 'সম্পদ '-দের হাতে নিয়মিত আক্রান্ত পুলিশ এবং শাসক দলের 'ভালো ' সংগঠকদের হুমকিতে ভীত পুলিশ যে অন্যায্য ও কাপুরুষোচিত ভাবে এক দল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের ও অনশনরত ছাত্র -যুবদের গ্রেন্তার করল তা ন্যক্কারজনক।

রাজনীতি নয় , অ -রাজনীতিএ রকম নিন্দনীয় ঘটনা তখন হয় যখন গোটা সমাজে বহু বছর ধরে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সেই বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া তখন সম্ভব হয় যখন সত্ ব্যক্তি রাজনীতি ছাড়ে। শঠ ব্যক্তি সেই জায়গা পূরণ করে। দাবির রাজনীতির ভাষা হারিয়ে যায়। দাবানোর ভাষা প্রকট হয়ে ওঠে। রাজনীতির মৃত্যু ঘটিয়ে হিংসা সমাজকে গ্রাস করে। গণতান্ত্রিক দাবির উপর ভিত্তি করে , সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এবং সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে দীর্ঘ গণআন্দোলন যখন বছরের পর বছর না হয় তখন সমাজে হক কথা বলার জন্য দূরবিন দিয়ে লোক খুঁজতে হয়। এই রকম সন্ধিক্ষণে মানুষ তার অধিকারবোধ হারায়। আত্মসম্মান হারায়। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার মতো এতটুকু সাহস আর অবশিষ্ট থাকে না। চারদিকে ধান্দাবাজ ও ধাপ্পাবাজদের রমরমা হয়। মেরুদণ্ড হারিয়ে সরীসৃপে পরিণত হওয়া চাটুকার ও স্তাবকদের উদ্দাম উদ্বাহু নৃত্য বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ তখন আরও রাজনীতি বিমুখ হন , রাজনীতির কথা শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন ,

রাজনীতি খারাপ বলে এক সহজ নিরাশাবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অন্য দিকে , বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে এখানে 'দল সমাজ ' (পার্টি সোসাইটি ) কায়েম হয়ে আছে যেমন রাজনীতিশাস্ত্রের এক গুণী গবেষক মনে করেন। কিন্তু রাজনীতির আর একটা শিক্ষা হল যে তা স্থিতিশীল নয়। কোনও সিস্টেম আদি অনন্ত কাল ধরে চলতে পারে না। দিল্লিতে নাগরিক আন্দোলন দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং জল ও বিদ্যুতের দাবিতে যেমন রাজ্য সরকার পরিবর্তন করেছিল , সে রকম কিছু কি পশ্চিমবঙ্গে ভাবা যেতে পারে না ? সে রকম কিছু করতে গেলে মানুষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো নিয়ে দীর্ঘ গণআন্দোলনের প্রয়োজন আছে। সেই গতিময় রাজনীতির প্রবহমান ধারার মূল চালিকাশক্তি হল মানুষ। বাংলার জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষকেই তাই ঠিক করতে হবে যে এ বার একটু প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোকে বলার সময় হয়েছে 'তোমরা আর আমাদের বেশি দিন দাবিয়ে রাখতে পারবে না '। End

মইদুল ইসলাম প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক , গর্গ চট্টোপাধ্যায় কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে শিক্ষক[আসলে পশ্চিমবঙ্গে বহু বছর ধরে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া চলেছে। অতএব দুর্বল হয়েছে দাবি জানানোর রাজনৈতিক ভাষা। সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করেছে হিংসা। লিখছেন মইদুল ইসলাম ও গর্গ চট্টোপাধ্যায়যারা ঘরে থাকায় ধর্মঘটকে সফল বলা হল , যারা আলিমুদ্দিন থেকে অভিনন্দিত হল , তাদেরকে এই ধর্মঘটের ইস্যুগুলির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁরা কী করলেন ? প্রায় কিসুই না। যেমন তাঁরা বলতেন 'মানুষ ভুল করেছেন ', আজও বোধ হয় তাঁরা আশা করেন , মানুষ চাটাইয়ে সাঁটা পার্টির কাগজ দেখে নিজে নিজেই ইস্যুগুলি বুঝে নেবেন।] → Caption inside text.

পি টি আই।

Enlarge Image